

বাঙালির যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ও ভবিষ্যতের বাঙালির দর্শন

পারভেজ ইমাম

আজকের সভার সম্মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

এই প্রথমবারের মত অনুষ্ঠেয় সরদার ফজলুল করিম স্মারক বক্তৃতার সুযোগ আমার তুল্য একজন অকৃতী ব্যক্তিকে প্রদান করায় আমি যুগপৎ গৌরবান্বিত ও সংকুচিত। এই স্মারক বক্তৃতা প্রবর্তনের জন্য আমি প্রথমেই সাধুবাদ জানাই বাঙালির পাঠশালা ফাউন্ডেশনের কর্তাদেরকে। পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশুদের শিক্ষাদান হতে শুরু করে মেধা ও মননচর্চা সম্পর্কিত তাদের সকল উদ্যোগই সমীহযোগ্য। আমাদের জাতীয় অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রেরণাদাতা ও সর্বোপরি জাতির অভিভাবক। নিছক নিষ্ঠ্রিয় চিন্তক তিনি নন, বরং চিন্তায় ও কর্মে রাজনৈতিক সংগ্রামে সদাসক্রিয় এক আপোষহীন বুদ্ধিজীবী তিনি। তাঁর যুক্তিবাদী চেতনাকে মনে রেখে ‘বাঙালির যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ও ভবিষ্যতের বাঙালির দর্শন’ শীর্ষক আজকের বক্তৃতাটিকে প্রাসঙ্গিক বোধ করছি। এ ব্যাপারে আমার যোগ্যতার দৈন্য ও সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়েই বিনোদভাবে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ভারতবর্ষের যে এলাকাটি বাংলা বা বাংলাদেশ নামে পরিচিত ছিল ভৌগোলিকভাবে তার পরিসর ছিল আজকের বাংলাদেশ হতে বৃহত্তর এবং ইতিহাসের সকল পর্যায়েই এর স্বতন্ত্র পরিচিতি ছিল। প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে পুঁতি, বরেন্দ্র, রাঢ়, সমতট, হরিকেল, বঙ্গল প্রভৃতি জনপদের অস্তিত্ব ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০০ হতে ১০০০ এর মধ্যে রচিত ঐতরেয় ব্রাক্ষণে পুঁত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় ঐতরেয় আরণ্যকে। ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে শামসুন্দীন ইলিয়াস শাহ বঙ্গ, রাঢ় ও বরেন্দ্রকে একত্রিত করার পর বাঙালি নামটির প্রচলন শুরু হয়। এই বৃহৎ বঙ্গকেই আরব-তুর্কী-মোগলরা বানজালা নামে, চীনারা মানচালা নামে, ইউরোপীয়ানরা বেঙ্গল নামে চিহ্নিত করেছে।

বাংলা এলাকাবাসী বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীই সাধারণভাবে বাঙালি নামে পরিচিত। বাঙালি সন্তুষ্ট জাতি। আদি-অন্ত্রীয় নরগোষ্ঠীর অঙ্গর্গত কোলিড শাখার মানুষদেরকেই এদেশের প্রকৃত আদিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন নীহাররঞ্জন রায়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এর সাথে সংমিশ্রিত হয়েছে দ্রাবিড়ভাষী ও মঙ্গোলয়েড ধারার ভোট-চৈনিক জনগোষ্ঠী; এবং আরও পরে স্বল্পমাত্রায় আর্য ও আরবী পারসী তুর্কী ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর রক্তও মিশেছে বাঙালির রক্তে। এই সাক্ষর্যহেতুই বাঙালি তার স্বভাবে অনন্য, মানসে স্বতন্ত্র। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে শাসন, শাস্ত্র ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উত্তর ভারতের আধিপত্যকে বাঙালি যথাসম্ভব প্রতিরোধ করেছে। বাঙালি চিরবিদ্রোহী, রাজনৈতিকভাবে কেন্দ্রের শাসনকে প্রায়ই অস্বীকার করেছেন বাংলার শাসকেরা। ব্রাহ্মণ ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করলেও বাঙালি এসব ধর্মের চিরায়ত রূপটিকে অক্ষুণ্ণ রাখেনি, বাঙালির জনমানসের সঙ্গে সাযুজ্যবিধান করেই এসব গ্রহণ করেছে। একই কথা প্রযোজ্য সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্ষেত্রেও।

বাঙালির কোনো নিজস্ব দর্শন নেই বলে আক্ষেপ করা হয়। অস্তত পাশ্চাত্যের অর্থে যাকে দর্শন বলে তেমন কোনো চিন্তার পরিচয় বাঙালির মননচর্চার ইতিহাসে পাওয়া যায় না এমন অভিযোগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি

তত্ত্বালোচনায় কখনোই তেমন আগ্রহ পোষণ করেনি। জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে বাঙালি মধ্যযুগে কিছু অবদান রেখেছে নব্যন্যায় ও ষড়দর্শনের চর্চায়। এ প্রসঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালংকার প্রমুখ নব্য-নৈয়ায়িক, বেদান্ত ভাষ্যকার প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও মধুসূদন সরস্বতীর নাম উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এসব চর্চাও করা হয়েছে মোক্ষতত্ত্বের অনুগামী সহগামী ও পরিপূরক জ্ঞান ভিত্তি নির্মাণের লক্ষ্যে। আধুনিক যুগে ইংরেজ শাসনামলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙালির চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর এই তথাকথিত বেঙ্গল রেনেসাঁস মুক্ত চিন্তার সুযোগ সৃষ্টি করলেও এই রেনেসাঁসেরও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল যা আমরা পরবর্তীতে উল্লেখ করব। আসলে ইতিহাসের ধারায় ক্ষয়িক্ষ্য সামন্তবাদ ও অর্ধবিকশিত পুঁজিবাদের আওতায় বাঙালির চেতনা সম্পূর্ণভাবে শৃঙ্খলমুক্ত হতে পারেনি। বাঙালির চিন্তা ও তত্ত্বে ভাববাদী নয়, ভাববাদ ও জড়বাদের তথাকথিত মধুর সময়ও নয়। বাঙালির চিন্তায় ও জীবনচর্যায় বহু প্রগতিশীল উপাদান আছে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগে এসবকে উপেক্ষা করে শাস্ত্রানুগত মোক্ষকামী পরলোকমুখী বৈরাগ্যবাদী ধারণাগুলিকেই অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে অথবা এসব প্রগতিশীল উপাদানগুলিকে ধর্মীয় মোড়কে আবৃত করা হয়েছে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও। সর্বোপরি এসব দুষ্কৃতি সম্পাদন করা হয়েছে রাজতন্ত্র ও পুরোহিতত্ত্ব-মৌল্যাতন্ত্রের আওতায় এবং এই বিকৃত চেতনা সবলে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বভাবত ধর্মভার ও কোমলপ্রাণ জনসাধারণের মানসের ওপর। পরবর্তীতে এই নিষ্ঠিত জীবনদর্শন ও নীতিদর্শন যুগসংক্ষিত সংস্কারে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালির চিন্তার মূল প্রবণতাটি যুক্তিবাদী অর্থাৎ সংস্কারমুক্তভাবে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের প্রচেষ্টা চিরকালই বাঙালির ছিল, সেটি কম-বেশী যে মাত্রায়ই হোক না কেন। এরই আনুষাঙ্গিকভাবে এসেছে ইহলোকমুখিতা ধর্মনিরপেক্ষতা মানবতাবাদ ইত্যাদি প্রবণতা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মানবতাবাদ বা humanism এর অর্থ ঈশ্বর বা কোনো অতিথাকৃত সত্তা অপেক্ষা মানুষের উপর গুরুত্বারোপ বা মানুষকে মর্যাদা দেওয়া, যেমন চৰ্ণীদাস সবার উপরে মানুষ সত্য বলে মনে করেছেন। অপরপক্ষে মানবিকতাবাদ বা humanitarianism-এর অর্থ দয়া করণ সহানুভূতি ইত্যাদি কোমল গুণের চর্চা। অনেকে এই মানবিকতাবাদকেই মানবতাবাদ নামে উল্লেখ করেন। বাঙালি প্রকৃত ও প্রচলিত উভয় অর্থেই মানবতাবাদী। যাইহোক, আমরা বলতে চাই যে বাঙালির চিরায়ত চিন্তার প্রগতিশীল উপাদানগুলিকে সনাত্ত করে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ভবিষ্যতের বাঙালির জন্য এক বলিষ্ঠ জীবনমুখী দর্শনের রূপরেখা গড়ে তুলতে হবে এবং এখনই তার সময়।

আর্যাবর্তে প্রচলিত বৈদিক ধর্ম ও দর্শন বাংলাদেশে প্রসারিত হয়েছে অনেক পরে, তাও ধীরগতিতে ও স্বল্প বিস্তারে। সুতরাং প্রাচীনকালে বাঙালির জীবন ছিল অনার্য সংস্কৃতিভিত্তিক। তাই লোকায়ত দর্শনেই হয়তো বাঙালি তার জীবন ও জগৎ বিষয়ক অনুসন্ধিৎসার মীমাংসা খুঁজে পেয়েছে এমন অনুমান করা যেতে পারে। তবে লোকায়ত দর্শন বাঙালি জনমানসকে কতখানি প্রভাবান্বিত করেছে তা নির্ণয় করা এখন দুঃসাধ্য। সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ইহলোকভিত্তিক দর্শনই লোকায়ত দর্শন। লোকায়ত দর্শন তথা চার্বাক দর্শন মতে ক্ষিতি অপ তেজ ও মরণ হলো জগতের মূল উপাদান, এসবের বিশেষ অনুপাতেই দেহে চেতনার উৎপত্তি হয়। সুতরাং চার্বাক দর্শন দেহাত্মাবাদী। চার্বাক দর্শন ঈশ্বর পরলোক স্বর্গ-নরক ইত্যাদির ধারণাকেও অস্বীকার করে, অস্বীকার করে কার্যকারণ সম্বন্ধের আবশ্যিকতাকেও এবং প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রয়াণ হিসেবে গণ্য করে। মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে চার্বাক দর্শনের বর্ণনায় বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চার্বাকদের প্রদত্ত যেসব যুক্তির উল্লেখ রয়েছে সেসবে চার্বাক দর্শনের কঠোর যুক্তিনিষ্ঠা ও তার সহলক্ষণ সংশয়বাদী প্রবণতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বেদবিরোধী অপর যে দর্শনটি বাংলাদেশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শন। বিনয় পিটকে পুঁজের উল্লেখ পাওয়া যায়, বঙ্গের নামটি পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ত্তীয়-চতুর্থ শতকের নাগার্জুনকোভার শিলালেখমালায়। মোর্য সম্রাট অশোকের সময় হিউ-এন-সাং ও গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ফা-হিয়েন এই দুইজন চীনা পরিব্রাজক বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে বাংলার বহু স্থানে বৌদ্ধ ধর্মস্মৃতিপের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাল রাজত্বের চারশত বছর ছিল বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের স্বর্ণযুগ। পাল রাজারা নিজেরা ছিলেন বৌদ্ধ এবং তারা বাংলার বহু স্থানে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন যেসবের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এসব বৌদ্ধবিহারে বাসরত ভিক্ষুদের জীবনযাত্রার ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থায়ন করতেন রাজন্যবর্গ ও ধনী ব্যবসায়ীরা। তবে বৌদ্ধধর্ম সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন নিম্নবিভিন্ন শ্রেণীর ও নিম্নবর্ণের মানুষেরা, কারণ বৌদ্ধধর্ম ছিল বর্ণবাদ জাতিভেদ যাগযজ্ঞ ও পশুবলির বিরোধী। বুদ্ধদেব এমনও বলেছিলেন যে গঙ্গাস্নান করেই যদি মুক্তিলাভ ঘটত তবে সব মাছেরাই কেবল মুক্তিলাভের যোগ্য হত। বুদ্ধ মনে করতেন যে জন্ম নয়, বরং কর্ম ও চরিত্রই মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড। তার সাম্য, অহিংসা ও মৈত্রীর ধারণা অন্তর্জ শ্রেণীকে পুরোহিতদের দৌরাত্ম্য ও ক্ষমতাবানদের শোষণের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব সংগ্রামে উদ্বৃদ্ধ করেছিল; সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব ইত্যাদির ধারণা কার্যকর নীতিসমূহ এক জীবনদর্শন গঠনে আপামর জনসাধারণকে প্রগোদনা দিতে সক্ষম হয়েছিল। তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে বৌদ্ধধর্ম ছিল ব্রাহ্মণত্বের বিরোধী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত শুদ্ধজনের ধর্ম। সর্বোপরি বৌদ্ধধর্ম যুক্তিবাদী। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে বৌদ্ধধর্ম প্রত্যক্ষবাদী, তাই তা স্থায়ী আত্মার ধারণায় অনাস্থা পোষণ করেছে, অনিত্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, ঈশ্বর সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছে। তবে পরবর্তীকালে মূল বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন ক্লান্তিরিত হয়ে বিভিন্ন মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বাঙালির চর্চিত বৌদ্ধধর্মে গুহ্য সাধনতত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, পূজার প্রবর্তন হয়েছে, নৈর্ব্যত্বিক দর্শনের অপেক্ষা মন্ত্র-তত্ত্বের ধারণাগুলির চর্চা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদিমতম নির্দশন চর্যাপদেও এর প্রমাণ বিধৃত রয়েছে। তবু বাঙালি মানসে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ইত্যাদির ইতিবাচক প্রভাব অনন্বীক্ষ্য।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক হতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে, বিশেষত উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে। তারই প্রতিক্রিয়ায় সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। এর অন্যতম হোতা কেরালার ব্রাহ্মণতণ্য শক্ররাচার্য। তিনি ভারতবর্ষের চার কোণে চারটি মঠ স্থাপন করেন, শারীরকভাষ্য রচনা করে কেবলাদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করেন, বেদান্ত দর্শনকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। তবে বাঙালি শক্ররাচার্যের নির্ণুণ ব্রহ্মের ধারণায় তৃপ্ত হয়নি, বরং বাঙালি সন্তোষ লাভ করেছে সঙ্গে ব্রহ্মের ধারণায় এবং অবতারবাদের ধারণায়। তাই বাঙালির মানসে গ্রহণযোগ্য হয়েছে বৈষ্ণববাদ, এরই নির্দশন হল ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। এরই ফলে ভক্তিবাদের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল সমগ্র বাংলাদেশ। তবু বৈষ্ণববাদের সর্বজীবে দয়ার নীতি তথা জাত-পাতের বন্ধন উত্তরিত হয়ে সর্বমানবপ্রীতির ধারণাটি ও জগতের বাস্তবতার স্থীকৃতিকে এর ইতিবাচক উপাদান বলে গণ্য করা যায়।

বাউল মত বাংলার লোকজ দর্শন। সপ্তদশ হতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। জন্মগতভাবে হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণীর মানুষই বাউল জীবনাদর্শের চর্চা করেছিলেন। বাউল মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ, গবেষণায় রত হয়েছিলেন শশীভূষণ দাশগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মুহুমদ মনসুরউদ্দীন, আহমদ শরীফ প্রমুখ গুণীজন। তাদের মেধা ও শ্রমঝুঁক গবেষণা হতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে

বাউল দর্শন এক ধরনের অধ্যাত্মাদ হলেও এই অধ্যাত্মাদ ইহলৌকিক। বাউলদের সাধনা দেহভিত্তিক। দেহেই আত্মার বাস এবং মানবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। সুতরাং বাউলদের কথিত মনের মানুষের অনুসন্ধানের সাধনা প্রকৃতপক্ষে আত্ম-অনুসন্ধানের প্রয়াস মাত্র। সুতরাং মানুষ ঐশ্বী সম্ভাবনাময়। বাউল মতাদর্শে গৃঢ় সাধনতত্ত্ব, গুরুবাদ ও সমাজবিচ্ছিন্ন নিজীব একধরনের বৈরাগ্যবাদের প্রাধান্য থাকলেও এর অনেক ইতিবাচক দিকও রয়েছে। বাউলেরা ছিলেন শাস্ত্রবিরোধী, কোনো বিশেষ ধর্মকে তাঁর অবলম্বন করতে চাননি। মন্দির-মসজিদে ঢাকা পথে নয়, জীবনের সহজ-সরল পথেই হাঁটতে চেয়েছিলেন বাউল সাধকেরা। জাতিভেদকে তাঁর গানের মাধ্যমেই আক্রমণ করেছিলেন লালন শাহ। বাউল দর্শন অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী।

সুফীবাদ ইসলামের মরমীবাদী সাধনপন্থা। গোঁড়া ইসলামের সঙ্গে এর ব্যবধান রয়েছে, কারণ সুফীবাদ সর্বেশ্বরবাদী ও গুরুবাদী। বাংলাদেশে অষ্টম হতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে এর প্রসার ঘটেছে। মুসলিম রাজপুরূষ, সেনাদল ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যেসব ধর্মপ্রচারক ও দরবেশ এদেশে এসেছিলেন তাদের মাধ্যমেই এই ভাবধারার বিকাশ ঘটেছিল। সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলায় ব্রাহ্মণবাদের পুনরুত্থান ঘটে এবং ধর্মের নামে রাজশাস্ত্রির ছত্রচায়ায় গোত্র বিভাজনের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। এই সব লাঞ্ছিত ও শোষিত নিম্নবর্গের মানুষেরাই ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে মুক্ত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ও ধর্মচর্চার সরল পথ বিবেচনা করেই সুফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে মধ্যপ্রাচ্যের চিরায়ত সুফীবাদ বাংলায় এক লোকায়ত রূপ ধারণ করেছিল। এটিই হল নব্য-সুফীবাদ। এতে চিরায়ত সুফীবাদের মূলতত্ত্বগুলির সঙ্গে লোকজ তত্ত্ব যোগ দেহসাধনা ও গুরুবাদ বা পীরতত্ত্ব সমন্বিত হয়েছে, এমনকি বলা যায় প্রাধান্য লাভ করেছে। মুহম্মদ এনামুল হক, আহমদ শরীফ প্রমুখের গবেষণায় আমরা নব্য-সুফীবাদের আল্লাহতত্ত্ব, আত্মাতত্ত্ব, নূরনবীতত্ত্ব ইত্যাদির বিবরণ পাই। আমরা দেখি যে বাংলার নব্য-সুফীবাদে আল্লাহকে ‘হরি’ ‘শিব’ ‘ব্ৰহ্মা’ ইত্যাদি নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে। তত্ত্বাধনার ষষ্ঠাড়ীচক্র ও নব্য-সুফীবাদের ছয় লতিফার তত্ত্ব এক ও অভিন্ন। এই পরমতসহিষ্ণুতা নব্য-সুফীবাদের অনন্য লক্ষণ। আমরা আরও জানতে পারি যে নব্য-সুফীরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সেবা করেছেন ও শিক্ষাবিস্তারসহ নানা মানবিকতাবাদী কর্মে ব্রহ্মী হয়েছেন। এসবের মধ্যে তাঁদের ইহজাগতিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নব্য-সুফীবাদের এই দিকগুলিকে আলোকিত করা প্রয়োজন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার যে ভাবান্দোলনকে ‘বাংলার রেনেসাঁস’ নামে অভিহিত করা হয় তার কিছু ক্ষেত্র ও সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রথমত: তখন সমগ্র ভারত ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। যে দেশ স্থাধীন নয় সে দেশে প্রকৃত রেনেসাঁস অসম্ভব। দ্বিতীয়ত: রেনেসাঁসের উপযুক্ত আর্থ-সামাজিক ভিত্তিই তখন নির্মিত হয়নি। কারণ এদেশে কোনো শিল্পবিপ্লব হয়নি। চিরঢ়ায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এ দেশের উঠতি ধনিক-বণিকদের বাণিজ্যলক্ষ অর্থ প্রত্যাবর্তিত হয়েছিল জমিতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত উদ্যোগী পুরুষও জমিদারী কিনে সামন্তবাদী জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধ অবলম্বন করেছিলেন। তৃতীয়ত: এটি কেবল কলকাতা নগরকেন্দ্রিক ছিল; এর বাইরে বিশাল বঙ্গে এর কোনো প্রভাব ছিল না, পূর্ববঙ্গে তো নয়ই। চতুর্থত: এই রেনেসাঁসের ধারক-বাহকরা ছিলেন হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর অত্তর্ভুক্ত, বাংলার মুসলমান সমাজ থেকে গিয়েছিল এই রেনেসাঁসের বাইরে। প্রকারান্তরে এই রেনেসাঁসের পথ ধরেই উত্থান ঘটেছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের যা প্রত্যাখ্যান করেছিল বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে। আমাদের জাতীয় জীবনে এর পরিণাম শুভ হয়নি। পঞ্চমত: এই রেনেসাঁসের কালেও মধ্যযুগীয় সামাজিক ভিত্তির অন্তর্গত কাঠামো অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল, যেটুকু সীমিত পরিবর্তন ঘটেছিল তা ছিল আরোপিত, তা বাংলার

সমাজ বিবর্তনের কার্যকারণ-শৃঙ্খলাগত পরিণতি নয়। ষষ্ঠত: বাংলার রেনেসাঁস মূলত ছিল নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য বিদ্যা-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় অভিজাত ব্যক্তির মতিঝ্কের আন্দোলন, গণমানুষের আন্দোলন নয়। সপ্তমত: রেনেসাঁসের আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীরা শুধু জনবিচ্ছিন্নই ছিলেন না, সংগ্রামবিমুখও ছিলেন। যেহেতু এরা প্রায় সকলেই ছিলেন জমিদার বা উপস্থত্বভোগী-মধ্যস্থত্বভোগী শ্রেণীর মানুষ সেহেতু তাঁরা ইংরেজ রাজত্বকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করে গণ-অসংগোষ ও প্রজাবিদ্রোহের সঙ্গে প্রায় নিঃসম্পর্কিত থেকে গেছেন, কেউ কেউ ত্রিপনিবেশিক শাসন ও সামন্ততাত্ত্বিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামের বিরোধিতাও করেছেন। এসব সত্ত্বেও বাংলার রেনেসাঁসের কয়েকজন প্রাণপুরুষের ইতিবাচক অবদানগুলিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

বাংলার রেনেসাঁসের সর্বাধিগণ্য ব্যক্তিত্ব হলেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। একত্রিশটি বাংলা ও ছেচলিশটি ইংরেজিসহ কমপক্ষে আশিটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। শঙ্করাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার ও পাঁচটি উপনিষদের অনুবাদ ব্যতীত তার অধিকাংশ পুস্তকই ছিল প্রাত্মা-বিচার-বিতর্কমূলক। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭) ইত্যাদি সাকারবাদের বিরুদ্ধে, *An Appeal to the Christian Public* (১৮২০) ইত্যাদি শ্রিষ্টিয় ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে এবং সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নির্বর্তকের সম্বাদ (১৮১৮) ইত্যাদি সতীদাহের বিরুদ্ধে রচিত পুস্তক। এসবে তাঁর প্রবল যুক্তিবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মুতাজিলা সম্প্রদায়ের কঠোর যুক্তিবাদের সঙ্গে শ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ এবং উপনিষদে বিধিত অথচ প্রায়-বিস্তৃত ব্রহ্মবাদকে একসূত্রে গ্রথিত করার প্রয়াস পান। সকল গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ধর্মকে মানবীয় কল্যাণবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করাকে যদি ধর্মনিরপেক্ষ জীবননির্দশন আখ্যা দেওয়া যায় তবে সেই অর্থে রামমোহন ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তা। কেবল বিশ্বাস নয়, তাঁর অধ্যয়ন-চাকুরি-পানাহার-সংসর্গ-রচনা-বিতর্ক সংক্ষার আন্দোলন ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়েই তাঁকে আমরা সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির প্রতিভূ হিসেবেই দেখতে পাই। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভার ন্যাসপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাগৃহ জাতি-ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার জন্য উন্নুক্ত থাকবে, সেখানে কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক প্রতীক বা প্রতিমূর্তি থাকবে না, কোনো সম্প্রদায়ের শাস্ত্র-দেবতা-গুরুর নিন্দা করা যাবে না। ধর্মনিরপেক্ষতার এমন শুভ-সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ইতালীয় রেনেসাঁসেও দুর্লভ। সেকালের বিবেচনায় কালাপানি পেরনোর শাস্ত্রীয় নিষেধ লজ্জনের সাহস তাঁর ছিল। স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি দেশের তৎকালীন আন্দোলন ও রাজনৈতিক সামাজিক ঘটনাবলীতে রামমোহন যে উদ্দীপ্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাতে তাঁকে বৈশিক মানব বলতেই হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) যুক্তিবাদ সম্বৃত রামমোহন অপেক্ষাও তীব্র ও আপোষহীন। তিনি ছিলেন প্রকৃতিবাদী ও অঙ্গেয়তাবাদী। এক বিখ্যাত সমীকরণে তিনি প্রার্থনার নিষ্ফলতা প্রতিপাদন করেছিলেন। তাঁর মতে প্রার্থনার পরিবর্তে প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করলেই সুখী হওয়া যায়। একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন: ‘আখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য।’ শিক্ষা, অর্থনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিষয়ক তাঁর অভিমত অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ। বিধিবা বিবাহ, অস্বর্ণ বিবাহ, প্রাক-বিবাহ প্রণয়, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদিকেও তিনি যুক্তি সহকারে সমর্থন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনাচরণেও তিনি প্রচলিত কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এসবই তাঁর প্রাত্মসর ও মানবকল্যাণকামী মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

বাংলার রেনেসাঁসের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) তিনি ছিলেন নিজ যোগ্যতায় বিদ্যা ও কর্মে অনন্য এবং আপোষহীন ও আত্মর্যাদাবোধসম্পন্ন সিংহপুরুষ। তাঁর মতো ঝজু কর্মিষ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী যে কোনো দেশ ও কালেই বিরল। তাঁর চিন্তায় ও কর্মে তিনি ছিলেন অসাধারণ যুক্তিবাদী। যদিও রামমোহনের মতোই তাঁকে ক্ষেত্রবিশেষে শাস্ত্রকে প্রত্যাখ্যানের জন্য শাস্ত্রকেই অবলম্বন করতে হয়েছে। কারণ তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে অপরিণত জনমানসে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটিই ছিল উপযুক্ত পদ্ধা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে বিধিবা বিবাহের সমর্থনসূচক শ্লোকটি তিনি উদ্বার করেছিলেন পরাশর সংহিতা থেকে। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রকে আধুনিক সমাজের প্রয়োজনে শঙ্কের মতো ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। নিজে সংকৃত-পঞ্চিত হয়েও সংকৃত কলেজের পাঠ্যসূচি সংক্ষার করার প্রস্তাবে তিনি বলেছিলেন যে বেদাত দর্শন ও সাংখ্য দর্শন ভাস্ত এবং আধুনিক যুগে অচল। অপরপক্ষে পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক বার্কলীর দর্শন সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছিলেন। ভারতীয় দর্শনের সমাত্রালে তিনি আধুনিক যুগোপযোগী পাশ্চাত্য দর্শনকেও পাঠ্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন; যেমন মিলের লজিক সম্পূর্ণত পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন যে ধর্ম কী তা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জানার উপায় নেই, জানার কোনো প্রয়োজনও নেই। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষই ছিল মুখ্য।

ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ও ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিত তাঁর ছাত্রমণ্ডলী সম্পর্কে এমনও মন্তব্য করা হয়েছে যে এসব Angophile'রা এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কোনো স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে পারেননি এবং দেশীয় ঐতিহ্য হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছুত এইসব বাঙালি অথবা কিছু intellectual jugglery করে ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু একথা অন্যীকার্য পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদকে তাঁরা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, কখনোবা শাসনতাত্ত্বিক রীতিনীতি ও বিচার-ব্যবস্থাকেও তাঁরা প্রশংসিত মনে নেননি। জিজ্ঞাসা বা যুক্তিসিদ্ধ যাচাই ছিল তাদের লক্ষ্য, তবে লক্ষ্যপূরণে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের তরঙ্গসূলভ অসংযত কর্মকাণ্ড সমালোচনাবিদ্ব হয়েছে। তবু বলা যায় যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রত্তি সভাসমিতি গঠন এবং ‘পার্থেনন’, ‘এনকোয়ারার’ ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁরা মুক্তবুদ্ধিচর্চার আবহ নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন।

বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) জীবনের প্রথম দিকের রচনাগুলি যুক্তিবাদী, কিন্তু তাঁর শেষ দিকের রচনাগুলি ছিল ভক্তিবাদী ও রক্ষণশীলতামূলক। এমনকি পূর্বের কোনো কোনো রচনা তাঁর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে অথবা সংশোধিত ও পুনর্লিখিত হয়েছে। তবু কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, শ্রীমত্তাগবতগীতা, দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম ইত্যাদি গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলা যায় যে সতর্ক ও বিচারশীল মন নিয়ে তিনি মূল ও প্রক্ষেপের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন, টীকা-ভাষ্যসমূহের বিকৃতি ও একপেশেমী নির্ধারণ করেছেন, অতিরঞ্জন অতিনেসর্গিকতা উদ্দেশ্যমূলকতার জঙ্গল দূর করে মূল গ্রন্থের শুদ্ধ পাঠে উপনীত হওয়ার ও যথাযথ মননধৰ্ম ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে তিনি কেবল আদর্শ মানুষের প্রকৃতিকেই অন্বেষণ করতে চেয়েছেন, কোনো অবতারের প্রকৃতিকে নয় (চতুর্থ খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থটিতে তিনি গুরু-শিষ্য সংলাপের মাধ্যমে পরিশীলিত পূর্ণাঙ্গ মানবের যে ধারণা উপস্থাপন করেছেন তাতে জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সঙ্গে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির স্ফুরণ অর্থাৎ শিল্পকলা চর্চার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। বক্ষিমের মাধ্যমেই কোঁতের মানবতাবাদ ও মিলের উপযোগবাদের সঙ্গে বাঙালি মননের পরিচয় ঘটেছে। একথা ঠিক যে আনন্দমৰ্থ উপন্যাসটি ছাড়াও ‘ভারত-কলঙ্ক’, ‘বাঙালার কলঙ্ক’, ‘বাঙালার ইতিহাস’ ইত্যাদি প্রবন্ধে বক্ষিমের প্রবল হিন্দুত্ববাদী মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। ‘সাম্য’,

‘বিড়াল’, ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রভৃতি রচনায় তিনি শাসক ও শোষকের অত্যাচার ও শোষণের কথা বলেছেন, সাধারণ মানুষের দুর্গত দুঃসহ জীবনের কথা বলেছেন, কিন্তু জমিদারী অথবা উপনিবেশিক শাসনের অবসান চাননি।

বঙ্গিমচন্দ্রের অনুরাগী ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিবাদের অনুসারী স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) সীমিত পরিসরে হলেও ছিলেন যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের সমর্থক। ধর্মপ্রচার অপেক্ষা দারিদ্র্য দূরীকরণকে তিনি জরুরী বলে মনে করেছেন, জনসেবার আদর্শকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাই শংকরের বেদান্ত দর্শনকে সমর্থন করা সত্ত্বেও বিশ্বপ্রপঞ্চকে মিথ্যা নয় বলে মনে করেছেন। তার ব্যবহারিক বেদান্ত কার্যোপযোগী এক জীবনদর্শন। এমনকি তিনি ভারতের ইতিহাসকে দান্তিক পদ্ধতিতে শ্রেণীসংগ্রামের ধারণার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন, ব্রাহ্মণবাদের নিন্দা করেছেন, অস্পৃশ্যবাদকে ‘প্রবল জাতীয় পাপ’ বলে উল্লেখ করেছেন। বিবেকানন্দ সমষ্টির জীবনকে ব্যষ্টির জীবন অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়েছেন, বৈষয়িক ও সামাজিক মুক্তির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন এবং এই লক্ষ্যে শক্তি ও সাহসের চর্চার প্রয়োজনের কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাঙালি মনীষার শ্রেষ্ঠ প্রতিভৃৎ। তিনি নিছক গগনবিহারী ভাববিলাসী কবি নন, বরং বিভিন্ন ধরনের রচনা ও বিচিত্র কর্মে আমরা তাঁর মর্ত্যমুখী মানবদরদী যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয় পাই। ভারতীয় জনমানসে চিরকাল বিদ্যমান বৈরাগ্য ও জীবনবিমুখতার ধারণায় তাঁর আস্থা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে মানতেন, ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মান্তিকাকে নয়। বিশ্বসন্দীপ্ত আধ্যাত্মিকতার পথ বেয়ে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদে উপনীত হয়েছিলেন। পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের ‘ধর্মমোহ’ নামক কবিতাটিতে তিনি বলেছেন: ‘ধর্মের বেশে মোহ এসে যাবে ধরে/ অঙ্ক সে জন মারে আর শুধু মরে।/ নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,/ ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।/ শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো/ শান্ত মানে না মানে মানুষের ভালো।’ সম্ভবত কেঁতের মতো রবীন্দ্রনাথও ঈশ্বরের হৃলে মানুষকেই প্রতিষ্ঠাপন করে তাঁকে যোগ্য মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, তাইতো তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছেন যে, ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।’ জীবনের মধ্যভাগ পর্যন্ত তিনি হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন কিন্তু বিশেষত গোরা উপন্যাসটির রচনাকাল হতে তিনি তাঁদের আওতার বাইরে চলে যান। কালান্তর নামক বহুলালোচিত প্রবন্ধগ্রন্থটিতে তিনি বলেছেন: ‘ধর্মের মিলেই যে দেশ মানুষকে মিলায় সে দেশ হতভাগ্য।’ হিন্দু-মুসলিম সমস্যা নিয়েও তিনি চিন্তা করেছেন। একই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন: ‘আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্বারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই।’ নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় এমনকি মুক্তধারা ও রক্তকরবী নাটকে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শোষণচক্রকে আঘাত করেছেন; তার দৃষ্টিতে পরশ্রমজীবীর চেয়ে পরিশ্রমজীবীরাই ছিল অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। তবে তিনি সম্পদের বৈষম্যের প্রতিবিধান কামনা করলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার বিলোপ চাননি। তিনি বর্ণপ্রথা ও অস্পৃশ্যতাবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। সমকালীন বিশ্বের উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষাবলম্বন করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গে ব্যক্ত তাঁর অভিমতসমূহ হতেই তাঁর যুক্তিবাদী মননের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশী পণ্য বর্জনকে তিনি অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর মনে করেছেন, চরকাতত্ত্বকে অযৌক্তিক আবেগপ্রসূত ভেবে প্রত্যাখ্যান করেছেন; এমনকি অহিংস রাজনীতির ফাঁকা বুলিও তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি, কারণ তাঁর মতে ক্রেতাকে উত্তেজিত করে অহিংসার মন্ত্রে তাঁকে বশ করা যায় না। যুক্তিবাদী বলেই রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের কালে গান্ধীর নির্দেশানুযায়ী শিক্ষালয় পরিত্যাগকে সমর্থন করেননি। মাত্তামা মাধ্যমে শিক্ষাদান ও অধীত বিদ্যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সামঝস্যের প্রয়োজনীয়তা তিনি যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেছেন।

বাঙালি হলেও মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) যথার্থই ছিলেন বিশ্বনাগরিক। জাতীয়তাবাদ থেকে মার্কসবাদের মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমে নব্যমানবতাবাদে উপনীত হন। এর মূলনীতিগুলি ছিল যুক্তি, নৈতিকতা ও মুক্তি। মানবেন্দ্রনাথের মতে যুক্তিপ্রবণতা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং এটিই হল তার ন্যায়পরায়ণতা ও মুক্তির আবেগের উৎস। প্রকৃতিতে যেমন নিয়ম-শৃঙ্খলা কার্যকর, মানুষের স্বভাবেও তেমনই নিয়ম-শৃঙ্খলা বিদ্যমান, এজনই মানুষ যুক্তিবাদী ও ন্যায়পরায়ণ। মানুষে মানুষে সঙ্গ ও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় যুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ হতেই নীতিনিষ্ঠা গড়ে ওঠে। মানবেন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী নীতিতত্ত্ব তাঁর বক্তবাদী বিশ্বতত্ত্বেই অঙ্গ। তাঁর *Reason, Romanticism and Revolution* গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে মানবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিনির্ভর নীতিতত্ত্ব মুক্তির তিনি প্রধান স্তুতি (vol. 2, p. 307)। এভাবে তিনি যেমন যুক্তিবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, তেমনই যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে সংসদীয় গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ ইত্যাদির সমালোচনা করেছেন; প্রশ্নবিদ্ব করেছেন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়কেই; এমনকি মার্কসবাদের কিছু মূল নীতি ও প্রত্যয়কেও।

অন্ততঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার মুসলমান সমাজের চিন্তার মুক্তি ঘটেনি। তবে পরে ব্রিটিশরাজ ও ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এবং বিশেষতঃ পাট শিল্পের বিকাশের ফলে মূলত কৃষিজীবী মুসলমান সমাজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় ও মুসলমান সমাজেও শিক্ষার বিভাগ ঘটে, আধুনিক মানসিকতার উন্নয়ন সম্ভব হয়। ফলত যুক্তিবাদ ও মানবিকতাবোধের চর্চা সূচিত হয়। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিন্তাবিদেরাও ছিলেন যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী। মীর মশাররফ গো-জীবন গ্রন্থে বাঙালি জাতির অগ্রগতির লক্ষ্যে হিন্দু ও মুসলমানের সৌহার্দ্য কামনা করেছিলেন। রোকেয়ার নারীবাদ বহুল-আলোচিত, কিন্তু লক্ষ করা উচিত যে সার্বিকভাবে তিনি যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী। ‘স্ত্রীজাতির অবনতি’ নামক একটি প্রবন্ধে নারীর অবমাননায় ধর্ম ও শাস্ত্রের অপপ্রয়োগ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন: ‘আমাদিগকে অঙ্গকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে টেশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ... এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রাচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।’ পরবর্তীকালে প্রবন্ধের এই অংশটি তাঁকে বর্জন করতে হয়েছিল। নজরুল তাঁর সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ঐতিহ্য হতেই অবলীলাক্রমে বিষয় উপর্যুক্ত বাকভঙ্গ প্রভৃতি হরণ করেছেন। জীবন ও সৃষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই সব রকম সাম্প্রদায়িক চেতনার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব হয়েছিল: ‘এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।’ প্রলয়-শিখা কাব্যগ্রন্থের ‘বিংশ শতাব্দী’ কবিতায় তিনি বলেছেন: ‘টাটায়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম নেশা/ ধৰ্মস করেছি ধর্ম্যাজকী পেশা/ ভাঙি মন্দির ভাঙি মসজিদ/ ভাঙি গির্জা গাহি সঙ্গীত/ এক মানবের একই রক্তমেশা/ কে শুনিবে আর ভজনালয়ের ত্রেষ্ণা।’ জাতের নামে বজ্জতি করে যে জাত-জালিয়াতরা তাঁদের ঘৃণা করেছেন তিনি। ধর্মব্যবসায়ীদের ভগ্নামিকে কত তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন নজরুল তাঁর প্রমাণ আমরা পাই তাঁর ‘হিন্দু-মুসলমান’ প্রবন্ধে: ‘হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়; কিন্তু তাদের চিকিৎসা, দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকি হিন্দুত্ব নয়, এটা হয়ত পতিত্ব। তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই ‘ত্ব’- মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি।’ একই ধরনের তীব্র আক্রমণাত্মক চেতনার পরিচয় আমরা পাই এক বিস্মৃত-প্রায় কবি আশরাফ আলী খানের (১৯০১-১৯৩৯) কবিতায়। পূর্ববঙ্গের এই কবি কিছুদিন ঢাকা ও কলকাতায় সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রবল আত্মর্যাদাবোধসম্পন্ন এই মানুষটি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হয়ে অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় কলকাতায় আত্মহত্যা করেছিলেন, তবু কারও সাহায্যপ্রার্থী হননি। ১৯৮৯ সালে ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত তাঁর

রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত ‘কঙ্কাল’ নামক দীর্ঘ কবিতাটির উল্লেখ করা যায়। হস্দয়ের শুন্দতার চেয়ে ধর্মের নামে বাহ্যিক আচার নিয়ে মোল্লা-পুরুষদের দৌরাত্যকে তিনি যেভাবে তীক্ষ্ণ শ্লেষে বিন্দু করেছেন তার পরিচয় আমরা এখানে পাই: ‘এমাম কহেন ব্যাটা তবে তোর দাড়ি নাই কেন মুখে?/ মুখে নাই যার দাড়ির বাহার, খোদা নাই তার বুকে/ কহিলাম দুখে— মোল্লা সাহেব বেশ তো কহিলে খাসা/ খোদা কি তোমার বাবুই পাখী যে দাড়িতে বাঁধবে বাসা।’ আরও লিখেছেন: ‘কহিল ঠাকুর— গোবর খাইয়া শুচি হোয়ে দাও পূজা/ তা না হলে বাপু এই বেলা দেখ পথটি আপন সোজা।/ কহিলাম দুখে গোবর খেলেই পাপ যদি ধুয়ে যায়/ গুবরে পোকাই ভক্ত প্রধান পূজুক সে দেবতার।’

১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণ শিক্ষক ও ছাত্রদের সমবয়ে গঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল মন্ত্রই ছিল: জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি যেখানে অসম্ভব। কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) ও আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), দুই মননশীল প্রবন্ধকার ছিলেন এই আন্দোলনের দুই রূপকার। মুসলিম সমাজের বন্ধমূল মধ্যবুগীয় ধ্যানধারণা আক্রমণ করেছেন ওদুদ। ‘শিক্ষা সংকট’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: ‘একদিন খাওয়ায় যেমন অন্যদিনের চলতে চায় না, এক যুগের চিন্তায়ও তেমন অন্য যুগের চলে না।’ ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি শাস্ত্র নয় বরং রাষ্ট্রের মূলনীতি কাঙ্গাল ও মানবহিত হওয়া উচিত বলে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। সংক্ষিতির কথা প্রবন্ধে তিনি যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেছেন যে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের মীমাংসাকলে দুই সম্প্রদায়ের পোশাক ও নামের ব্যবধান দূর করা এবং পারম্পরিক সামাজিক আদান-প্রদান এমনকি আন্তর্ধান বিবাহ পর্যন্ত সহজ হওয়া উচিত। আবুল হুসেন মনে করতেন ধর্মীয় মহাপুরুষেরা আদর্শ মাত্র, ‘সাধনার দ্বারা সাধারণ মানুষও তাঁদের অপেক্ষা বড় হতে পারে।’ ‘মুক্তির কথা’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: মানব মনের চলার পথে কোনো Full Stop নাই ... Full Stop অর্থ মৃত্যু। কাজেই যদি কোনো মহাপুরুষের দোহাই দিয়ে কেউ সেই Full Stop দিতে চায়, তাকে মানুষের মুক্তি-অভিসারী ব্যক্তিত্বের পরম শক্ত বলে মনে করব।’ ‘আদেশের নিহাহ’ প্রবন্ধে বলেছেন: ‘দেশ ও কালের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে ধর্ম-বিধিসমূহ সৃষ্টি হয়েছিল তা কখনও সনাতন হতে পারে না।’ একই প্রবন্ধে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে পর্দা-প্রথা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই অপমানকর ও লজ্জাকর। তার ভাষায় ‘পর্দার অন্তরালে মুসলমান নারীর দুর্বলতা এরপে লালিত হতে থাকে যে, তার ব্যক্তিত্ব একেবারে পুষ্টিলাভই করতে পারে না ... পর্দা তাকে অতি শৈশব হতেই ঐ একটিমাত্র বন্ত অর্থাৎ সতীত্বের কথা ভাবতে অভ্যন্ত করতে গিয়েই ঐ লালসাকেই পুষ্ট করে তোলে।’ কাজী নজরুল ইসলাম কাফের আখ্যা পেয়েছিলেন, মুসলিম সমাজপতিদের দ্বারা নিগৃহিত হয়েছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেন আর অকাল মৃত্যু আশরাফ আলী খানকে সকল লাঞ্ছনার আওতাবহির্ভূত করে দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় তথাকথিত পাকিস্তানী সংস্কৃতি গড়ে তোলার নামে মুক্তবুদ্ধি চর্চার সকল সম্ভাবনাকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। তবু এ সময়ের উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ হলেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) ও গোবিন্দ চন্দ্র দেব (১৯০৭-১৯৭১) প্রমুখ। প্রথম দুইজনের চিন্তার কেন্দ্র ছিল ধর্ম এবং এজন্যই তারা স্বজ্ঞাবাদের প্রতি অকৃষ্ট সমর্থন জানিয়েছেন। তবে একথা ঠিক যে কোনো শ্রেণীর স্বার্থে সমাজে ধর্মের অপব্যবহারকে তারা সমর্থন করেননি। যুক্তি-উর্ধ্ব স্বজ্ঞায় আস্থা রেখেছেন গোবিন্দ চন্দ্র দেবও। তাঁর সমন্বয়ী ভাববাদ উদ্দেশ্যগতভাবে নবকল্যাণকামী বটে, তবে ভাববাদী দৃষ্টিতে এক সত্তার মধ্যে সকল দ্বন্দ্বের নিরসনকে প্রগতি বলে মনে করা তাঁর চিন্তার দুর্বল দিক। প্রকৃতপক্ষে দ্বন্দ্বই প্রগতির বাহক। তাছাড়া জড়বাদ ও ভাববাদ, বিজ্ঞান ও ধর্ম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সমন্বয় অলীক কল্পনা

মাত্র। স্বশিক্ষিত লোকজ দার্শনিক আরজ আলী মাতুররের (১৯০০-১৯৮৫) কথাও আমরা ভুলতে চাই না। তাঁর মনোলোক ছিল মানবকল্যাণমুখী ও ইহলোকমুখী ধারণায় দীপ্তি। তীক্ষ্ণ যুক্তিবান দিয়ে তিনি ধর্মের অন্ধবিশ্বাস ও গেঁড়ামিকে আক্রমণ করেছেন, মুক্তবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে ভাববাদ ও রহস্যবাদের বিরোধিতা করেছেন। জীবনমুখী ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী দর্শনের আরেক প্রবন্ধ সাইদুর রহমান (১৯০৯-১৯৮৭)। তাঁর মতে কোনো বিশেষ মতবাদে অঙ্গ বিশ্বাস মানবসভ্যতার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। আবার ইহলোকে কিছু না পেয়ে পরকালে সবই পাওয়ার প্রত্যাশা নিছক কল্পনা মাত্র। প্রগতির জন্য প্রয়োজন সংক্ষারমুক্ত মন, কর্ম, ত্যাগ ও মানবকল্যাণের মানসিকতা।

যাইহোক, হাজার বছরের বাঙালির চিন্তাধারায় যেসব প্রগতিশীল উপাদান আমরা পাই সেসবের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বর্তমানের দর্শনসমূহ অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ ও বিশ্লেষণী দর্শনসহ সকল ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য জগতে তত্ত্ববিদ্যা আর স্বীকৃত নয়। অঙ্গবাদী দর্শন যেভাবে মানুষের অন্তর্জীবনের বিশ্লেষণ করেছে তেমন কোনো কিছু বাঙালির দর্শনে হয়তো নেই, কিন্তু অঙ্গবাদের নেতৃত্বিক দর্শন অর্থাৎ সার্ত-কথিত মানবতার পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃত্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণাটি বাঙালির চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রয়োগবাদী দার্শনিক ডিউঙ্গের অনুসরণে আমরা ঈশ্বরের ধারণাটিকে ভিন্ন তাৎপর্যে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর মতে ঈশ্বর কোনো সঙ্গীব সচেতন আধ্যাত্মিক সন্তা নয়, বরং আমাদের ক্রিয়াকলাপের চালিকাশক্তি হিসেবে কার্যকর যে সব আদর্শকে আমরা গ্রহণ করেছি সেসবের মূর্ত ঐক্য; আর ধর্ম হল বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ব্যক্তিস্তরের সঙ্গতি ও সংহতির অনুভব। মার্ক্সবাদের শ্রেণীসংগ্রামের ধারণাটিও বাঙালির ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এভাবে বাঙালির চিরায়ত দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটেই বর্তমান জগৎ ও জীবনের উপযোগী এক কার্যকর দর্শন গড়ে তোলার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

এইসূত্রে আমি আরেকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দর্শনের উন্নোব্র ঘটে, আবার দর্শনও সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক হয়; প্রমাণ রূপে, ভলটেয়ার বা মার্ক্সের দর্শন। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাপক পরিসরে দর্শনের চর্চা ও বিস্তারের উপযোগী কোনো পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। তাই জাতীয় মানসের প্রতিফলনকারী বা জনজীবনকে উদ্বৃদ্ধ করতে সক্ষম এমন কোনো দর্শনের উন্নোব্র সম্ভব হয়নি।

১৯৭১ সালে অনেক ত্যাগ ও বিসর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জনসাধারণের মুক্তি। বাংলাদেশের সংবিধানে সম্ভবত বিভিন্ন মত ও পথের মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যই চারটি আদর্শ নির্দেশ করা হয়েছিল: গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতারও বিধায়ক, সুতরাং একে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না করলেও চলে। আবার সমাজতন্ত্র আদর্শগতভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদী, তাই জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এই মতাদর্শের বিরোধিতা রয়েছে। আবার গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সহাবস্থান অসম্ভব। কারণ গণতন্ত্র ব্যক্তিস্ত্রয়বাদী, আর সমাজতন্ত্র সমষ্টিবাদী। তবে গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্যায় বা পথ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সুতরাং একটি আদর্শই টিকে থাকে, আর তা হল সমাজতন্ত্র। তবে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে: সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে অর্থনৈতিক বৈষম্য হতে মুক্তি ব্যতীত সামাজিক ন্যায়বিচারও অসম্ভব।

স্বাধীনতার পরও আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটেনি, বরং রাজনীতিতে শক্তির প্রয়োগ এখন পূর্বের চেয়েও বেশী। তাছাড়া রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের হাতে নেই। বিপুল সংখ্যক সংসদ সদস্যই হলেন

ধনী ব্যবসায়ী, সাবেক আমলা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা অথবা পারিবারিক সূত্রে আবির্ভূত ভুইফোড় নেতামাত্র। নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মের যে অভিজ্ঞতা একজন যোগ্য রাজনীতিবিদের থাকা প্রয়োজন তা তাদের নেই। সুতরাং এইসব তথাকথিত রাজনীতিবিদরা জনবিচ্ছিন্ন; তাই জনস্বার্থ নয়, বরং শ্রেণীস্বার্থ পূরণেই তারা সচেষ্ট থাকেন। রাজনীতির ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাশূন্যতার কারণেই তাঁরা স্বভাবে অসহিষ্ণু, সিদ্ধান্ত গ্রহণে হঠকারী ও কর্মকাণ্ডে অনিয়মতাত্ত্বিক। এসব কথা যেমন বুর্জোয়া গণতাত্ত্বিক দলগুলির ক্ষেত্রে সত্য তেমনই একথাও অনন্বীকার্য যে সমাজতন্ত্রমুখী রাজনৈতিক দলগুলিও জনগণকে যথাযথভাবে উদ্বৃদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে স্বতন্ত্র মতাদর্শাবলম্বী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালিঙ্কু বড় রাজনৈতিক দলগুলোর ছেছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। ধর্মের নামধারী দলগুলি জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে সম্বল করেই রাজনীতিতে তৎপর। এসব দলের নেতাদের চিন্তা-চেতনা মধ্যযুগের গভিতেই সীমাবদ্ধ; কার্যোপযোগী রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের কোনো স্বচ্ছ ধারণাই নেই। এছাড়া স্বাধীনতার পরও সরকারের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব পূর্বের মতোই থেকে গেছে।

এনজিওগুলি জনকল্যাণের কথা বললেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসবের কার্যক্রম বাণিজ্যমুখী; রাজনীতি ও প্রশাসনে তাদের অন্যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপও সমর্থনযোগ্য নয়। বিশ্বায়নের ধারণাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বায়ন যে প্রকৃতপক্ষে নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে উপনিবেশ স্থাপন না করে পুঁজি রণ্ধনার মাধ্যমে আধিপত্য বিভারের পুঁজিবাদী কৌশল মাত্র একথা জনগণকে বুঝাতে দেয়া হচ্ছে না। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী জনগণের সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন; তাঁরা প্রচলনভাবে হলেও পুঁজিবাদী শক্তির স্বার্থই পূরণ করছেন। এদের সমন্বয়ে গঠিত তথাকথিত সুশীল সমাজ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। এমন ধারণা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে সুশীল সমাজই জনগণের মুখ্যপাত্র এবং সরকার ও জনসাধারণের মধ্যবর্তী যোগসূত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুশীল সমাজের তত্ত্বটিই হল জনসাধারণের মধ্যে শ্রেণীচেতনার উন্নয়ন ও গণবিপ্লব সংগঠনকে প্রতিরোধ করার কৌশল মাত্র। সুশীল সমাজের সদস্যরা সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর অন্তর্গত বলেই তাঁরা শ্রেণীস্বার্থের উৎসর্বে উঠতে পারেন না।

একই ধরনের হতাশাব্যঙ্গক অবস্থা বিরাজ করছে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও। প্রকৃত জ্ঞান যে তত্ত্বের বিকাশ ও প্রয়োগের ফলেই আসে এই ধারণাটিকে উপেক্ষা করে তথ্যই জ্ঞান এমন একটি ভুল ধারণা দেওয়া হচ্ছে। পাশ্চাত্যের উত্তরাধুনিকতাবাদ বিদ্যে যাই তরঙ্গের প্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু এটি অতিম পর্বের পুঁজিবাদের cultural logic মাত্র। ঘাটের দশকের শেষাংশে ফ্রান্সের প্রগতিশীল ছাত্র-আন্দোলনসংশ্লিষ্ট চেতনাকে অবদমনের লক্ষ্যে পুঁজিবাদের মদদে এই মতাদর্শের উন্নয়ন ও বিভার ঘটে। তাছাড়া আমাদের সমাজে যেখানে এখনও আধুনিকতাই পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে পারেনি, সেখানে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণে উত্তরাধুনিকতাবাদ প্রয়োগযোগ্য মতাদর্শ হতে পারে না। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চাতেও পাশ্চাত্যের অন্ধ ও অক্ষম অনুকরণ করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই এসব বিদ্যা এদেশের জন্য অনুপযোগী। আবার ক্ষেত্রবিশেষে সেসবকে বিশেষ লক্ষ্য পূরণার্থে খণ্ডিত বা অপূর্ণরূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ দিক হতে এখন পর্যন্ত এদেশে বিদ্যায়তন্ত্রিকভাবে দর্শনের চর্চা প্রধানত পাশ্চাত্য দর্শনের অনুসারী।

আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের সম্মান কোর্সে প্রথম বর্ষের পাঠ্যসূচিতে দর্শনের সমস্যাবলী শিরোনামে যে পত্রটি আছে তাতে মন বা আত্মার অমরত্ব ও দেহ-মন বিষয়ক সমস্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেলেও তার ভূমিকা

হিসেবে গণ্য মনের স্বরূপ অধ্যায়টি কয়েক বৎসর পূর্বে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে এতে আত্মা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদী, জড়বাদী ইত্যাদি অভিমত সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ শিক্ষার্থীরা পেত। চতুর্থ বর্ষের পাঠ্যসূচিতে ধর্মদর্শন শীর্ষক পত্রে ঈশ্বরের অঙ্গত্বে বিশ্বাসবিরোধী মতসমূহ নামক প্রসঙ্গটি প্রথম থেকেই ছিল না, অথচ ধর্মদর্শন বিষয়ক যেকোনো পাঠ্যপুস্তকের এটি এক অপরিহার্য অংশ। দু'এক বৎসর পর আবার পাঠ্যসূচি হতে বর্জন করা হল ‘ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ক মতবাদসমূহ’ নামক দীর্ঘ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়টি। কর্তৃব্যক্তিরা সম্ভবত ভেবে আতঙ্কিত হয়েছেন যে এই সূত্র প্রেতবাদ, মানবাদ, ইন্দ্রজালবাদ ইত্যাদি তত্ত্বকে জানলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে যে ধর্ম অলৌকিক বা প্রত্যাদিষ্ট নয়, বরং মানুষের ইতিহাসের ধারায় মানুষের দ্বারাই এর উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। এমন কৃপমণ্ডুক মনোবৃত্তিই আমাদের বুদ্ধির প্রকাশ ও জ্ঞানের প্রসারকে অবরুদ্ধ করেছে। এ সকল প্রতিকুল পরিস্থিতি হতে উন্নরণের মতো শক্তি আমাদের আছে। সবার আগে প্রয়োজন জনসাধারণের আর্থসামাজিক মুক্তি। জনমানসের প্রতিফলনকারী কল্যাণমুখী কার্যোপযোগী এক বলিষ্ঠ জীবনমুখী দর্শনই এ লক্ষ্যপ্রণে সহায়ক হাতিয়ার হতে পারে যার অবকাঠামো সম্পর্কে পূর্বেই আভাস দেওয়া হয়েছে। এই দর্শনই বাঙালিকে নিয়ে আসবে আত্মপ্রত্যয়ের প্রোজেক্ট আলোয়, বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আশা প্রদান করে আত্মশক্তির বিকাশে দিবে অনুপ্রেরণা। দর্শন তো জীবনের জন্যই।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

রচনাকাল: ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ